তৃতীয় অধ্যায়

ভাষা বৈচিত্র্য : সামাজিক স্তরভেদ

মানুষ সৃষ্টিশীল জীব। অন্যান্য প্রাণী জগৎ থেকে স্বতন্ত্র কারণ মানুষ চিন্তা ও চেতনার অধিকারী। ভাষা সৃষ্টির অতি প্রাচীনকালে মনুষ্য সম্প্রদায় আকারে ইঙ্গিতে একে অপরের সাথে মনের ভাব বিনিময় করত। পরবর্তীকালে রেখা চিত্রের মাধ্যমে, আরো পরে বস্তু প্রতীকের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। মানুষ যেহেতু উন্নততর প্রাণী তাই চিন্তা ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ভাষার মাধ্যমে। মনের ভাব অন্যের কাছে পৌছে দেওয়ার তাগিদেই ভাষার জন্ম।

মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ প্রাণী। অতীতকালেগোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সমাজে বসবাস করে আসছে। মানুষেরা অতীতকাল থেকেই সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, শাসন-অনুশাসন বিভিন্ন সামাজিক দিকগুলি পালন করে চলেছে বর্তমান কাল অবধি। এই সমস্ত সামাজিক দিকগুলি (সমাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং মনের ভাব) অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে।অপরদিকে সমাজে বসবাসকারী মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টি হল ভাষা। অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ, সমাজ গড়ে তুলেছে এবং প্রয়োজনের তাগিদেই ভাষার জন্ম হয়েছে। সুতরাং ভাষা ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। সমাজ ও ভাষা চর্চার পূর্বে সমাজ ও ভাষা সম্পর্কে বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদের কথা আলোচনা করতে পারি :

ভাষা

ক) "স্পষ্টভাবে উচ্চারিত যথাযথ ধ্বনি সমষ্টি বা শব্দাবলীর সাহায্যে মানুষের যখন নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করে তখনই তাকে ভাষা বলা হয়।"[২]

খ) "মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজন বোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।"[৩]

গ) "মানুষের উচ্চারিত, নির্দিষ্ট, অর্থযুক্ত ধ্বনির সমষ্টিই হচ্ছে ভাষা।"[৪]

ঘ) "ভাষা হচ্ছে কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি যার অর্থগত দিক বিদ্যমান এবং বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত।"[৫]

সমাজ

ক. "নিবিড় পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে যখন মানুষ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে, তখন তাকে আমরা সমাজ বলে থাকি।"[৬]

খ. "যখন বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলা হয়।"[৭]

গ. "সমাজ হল-আচার এবং কর্তৃত্বের কার্যপ্রণালী ও পরস্পরিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভাগ, মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা-এসব কিছুর দ্বারা গঠিত এক ব্যবস্থা।"[৮]

উপরিউক্ত ভাষা ও সমাজের সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়,

১. বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টি হল ভাষা।

২. ধ্বনি সমষ্টি ভাবের বাহন ও অর্থের প্রতীক হতে হবে।

৩. ধ্বনি বা পদ বিন্যাস ক্রমানুসারে হতে হবে।

৪. সামাজিক প্রয়োজনে(সংস্কৃতি-আচার-ব্যবহার) মনের ভাব প্রকাশক হতে হবে।

৫. ভাষা ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মানুষের প্রয়োজনেই ভাষার সৃষ্টি। ভাষা আমাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সমাজের গভীরে তার শিকড় নিমজ্জিত। মানুষ যেমন ভাষার সৃষ্টি করেছে, তেমনি সমাজের সৃষ্টিকর্তা এই মানব সম্প্রদায়। সেই ভাষা বা সমাজের বিচার বিশ্লেষণ করলে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই বোধগম্য হয়। অর্থাৎ সমাজ ও ভাষা বিশ্লেষণ করলে মানুষটির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়, তাঁর সামাজিক পরিচয় জানা যায়। সমাজ ও ভাষা বিশ্লেষণ করে মানুষটির সামাজিক স্তর নির্ণয় করা সহজ সাধ্য হয়। মানুষটি কে বা কোথাকার, তা সহজেই বিশ্লেষিত হয় তেমনি লিঙ্গ, বয়স, জাতি, শিক্ষা ভেদে মানুষটির ভাষা ও উচ্চারণের মাধ্যমে সামাজিক স্তর নির্ণয় করতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ পবিত্র সরকার মহাশয় বলেছেন, "সমাজ-সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের সম্পর্ক বিষয়ে যাবতীয় দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য, তারই সঙ্গে আলোচ্য বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে সামাজিক

মানুষের মনোভাব ও আচরণ।"[৯] আবার, এ প্রসঙ্গে ড. মৃণাল নাথ মহাশয় বলেছেন, "বিভিন্ন রীতির বাক-ব্যবহার বা আর্থ-সামাজিক শ্রেণী, শিক্ষা, বয়স, লিঙ্গভেদ ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় এবং এসব সামাজিক কারণের সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, তখন তাকেই বলে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক ভেদ রূপ।"[১০] আবার কোথাও বলেছেন "কোন বিশেষ সামজিক শ্রেণীর সঙ্গে যদি ভাষা ব্যবহারের সংগঠনের পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকে এবং সেই সমস্ত ভাষিক তথ্যে যদি ঐক্যের সন্ধান অর্থাৎ কোন সংগঠন পাওয়া যায়, তাকেই সেই শ্রেণীর সামাজিক উপভাষা বলা হয়।"[১১] আবার ভাষাবিদ ড. রামেশ্বর শ' মহাশয় বলেছেন, "একই ভাষার মধ্যে সামাজিক স্তরভেদে এই যে পার্থক্য একে সামাজিক উপভাষা বলতে পারি।"[১২] বলতে পারি আঞ্চলিক নয়, সামাজিক স্তরভেদের ভাষা বৈচিত্র্য তাই হল সমাজভাষা। সমাজ ও সংস্কৃতি কতটা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ভাষার পরিবর্তন, ভাষার সমস্যা, ভাষা বৈচিত্র্য নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করাই হল সমাজভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

বস্তুতঃ কোন অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থকরি উপার্জনের ব্যবস্থা কম থাকলে সেই অঞ্চলের ভাষাবৈচিত্র্য ততোধিক হয়। যতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই অঞ্চলের ভাষা, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ সেই অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি। এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, কিভাবে লিঙ্গ, পেশা, বয়স, জাতি, শিক্ষা বাঁকুড়ার প্রবাদগুলিতে ভেদাভেদ এনেছে।

লিঙ্গ ভেদে -

পৃথিবীতে এমন কোন নির্দিষ্ট ভাষা নেই যা একমাত্র নারী বা পুরুষের ভাষা। তবুও সমাজভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে সামাজিক স্তরভেদে ভাষার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নারী-পুরুষ ভেদে ভাষার ভিন্নতা সম্ভব। নারীর অনুভূতি পুরুষের তুলনায় একটু বেশি। আবেগ প্রবণতাও একটু বেশি। তাই নারীদের মুখে বেশ কিছু বাড়তি আবেগময় ধ্বনি শোনা যায় — আহা, ওলো, লো ইত্যাদি। আবার নারী - মমতাময়ী, করুণাময়ী, কোমল প্রকৃতির তাই তাদের উচ্চারণ ভঙ্গি কিছুটা আদৃত পুরুষদের তুলনায়। যদিও নারীদের কোমল প্রকৃতির উচ্চারণ ভঙ্গি পরিবর্তন হয় তাদের, বাক-বিতণ্ডা, ঝগড়া-কলহের সময়। নারীর ধ্বনি ও উচ্চারণ ভঙ্গি যে পুরুষদের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়, তা বেশ কিছু শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এবং উচ্চারণের তারতম্যে নারী-পুরুষের ভাষার বিভেদটি লক্ষ্য করা যায়।

সংগৃহীত প্রবাদগুলিতে বক্তা-শ্রোতা-প্রসঙ্গ / উদ্দেশ্য তুলে ধরে আলোচনা করা হল -

বক্তা	প্রসঙ্গ / উদ্দেশ্য	শ্রোতা
১) নারী	নারী উদ্দেশ্যে	নারী
২) নারী	পুরুষ উদ্দেশ্যে	পুরুষ
৩) পুরুষ	পুরুষ উদ্দেশ্যে	নারী
৪) পুরুষ	নারী উদ্দেশ্যে	পুরুষ

নারী কণ্ঠে প্রবাদগুলি নারী বা পুরুষের উদ্দেশ্যে :

১. শুশনি শাগ বলে আমি / ডগে চাট্টি পাতা / ননদ ভাজে তুইলত্যে গিয়ে করি দুখখু কথ্যা। (ভানুমতি কালিন্দী, কেঞ্জাকুড়া, বাঁকুড়া-১)

একান্ত নারী মনের গভীর বেদনার প্রকাশ। গ্রাহক এবং প্রেরক উভয় নারী। সংসারে শান্তি পেতে নির্জনে বার্তালাপ করেছে।

২. যে দিনছ্যে সিতায় সিন্দুর / সে আস্যে নাই লিত্যে / আমার রং লাগ্যে নাই যেত্যে। (আদরি বাউরি, মচড়াকেন্দ, মেজিয়া)

'সিতায় সিন্দুর' শব্দের মধ্য দিয়ে প্রবাদটিতে ঘোষিত হয়েছে একজন বিবাহিত নারীর উক্তি। 'যে দিনছে' শব্দের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় তার স্বামীর কথা। স্বামীর উদ্দেশ্যে নারীর অপকট উক্তি।

৩. শ্বশুর ঘরের বড্ড জ্বাইল্যা / চইল্ল্যে বলে খইরখরাট্যা / না চইল্ল্যে বলে খঁড়্যা বউট্যা / চায়ল্যে বলে ড্যাবড্যাবাট্যা / না তাকাইল্যে বলে কানা বউট্যা / না খাইল্যে বলে পেট মর্যট্যা। (ইলা চক্রবর্তী, মাকড়কোল, ওন্দা)

বক্তা-নারী, শ্রোতা-নারী, উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষিত-শ্বশুরালয়ের নির্যাতন।

৬. একই সিঁন্দুর সবাই পর্যে / কপাল গুন্যে ঝিলিক মার্যে। (শুভদ্রা দে, বামুনআড়ি, কোতুলপুর)

'সিঁন্দুর' শব্দের দ্বারা বোঝা যায় প্রবাদটি নারীর উদ্দেশ্যই কথিত।

৭. শাশুড়ি ননদে কয় / ডালে ডাঁটা দিলে ভাল হয় / আমি যে গরিবের ঝি / শাগে পটাদিয়েছি। (বনলতা সু, বীরসিংহ, পাত্রসায়ের)

নারীর উদ্দেশ্যে অপর একজন নারী বলেছেন।

৮. আস্তে গাড়ি যেতে গাড়ি / স্বামী আমার গাছ ব্যাপারী। (পূর্ণিমা ভুঁইয়া, বীরসিংহ, পাত্রসায়ের)

নারী কণ্ঠে গৃহীত প্রবাদটি, তার স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেছেন।

৯. কি বইলব তুমাক্যে লাজ পাচ্ছে আমাকে। (কপ্পুরা বাউরি, ছাতনা, ঝাঁটিপাহাড়ী)

লজ্জা নারীর ভূষণ। তাই লাজ-লজ্জা-সোহাগ-আদর এগুলি নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য। উচ্চারণের তারতম্যে 'লাজ' শব্দের দ্বারা অনুভূতি প্রকাশ করেছে। নারী কণ্ঠ থেকে গৃহীত প্রবাদটি একান্তই নারীর প্রবাদ।

১০. কি কাপড়ের খেদ আছে / বসান দিব্যেক কাপড় গদিত্যে। (আদরী বাউরি, মচড়াকেন্দ, মেজিয়া)

নারীরা পরর্নিভরশীল তাই স্বামীর উপর ভাত-কাপড়ের ভরসা করতে হয়। প্রবাদটি নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত। স্বামীর প্রসঙ্গে ঝগড়ার সময় অপর নারীকে বলে থাকে।

১১. ওলো গিদারি বিটি / মাটির ঘর আর ভাতার আছে সবারই। (আদরী বাউরি, মচড়াকেন্দ, মেজিয়া) অথবা, তুর মতন আমার শাড়ি আছে লো / পরি নাই পরি নাই সেটা বাস্কই তুলা আছে ল।

কিছু কিছু ধ্বনি নারীদের একেবারে নিজস্ব সম্পদ। 'ওলো', 'হ্যালো', 'হ্যাঁলা', 'লো' ইত্যাদি শব্দগুলি একজন গ্রামীণ নারী অপর নারীদের উদ্দ্যেশ্যে প্রয়োগ করে থাকে। বর্তমানে এই সমস্ত শব্দগুলি শহরাঞ্চলের শিষ্ট ভাষার একেবারেই অপ্রচলিত।

১২. ঘরের শত্তুর বিবিসন। (শ্যামলী দে, বাহাদুরগঞ্জ, বিষ্ণুপুর)

গ্রাম্য নারীরা ধ্বনিকে টেনে টেনে উচ্চারণ করে থাকে। কখনো স্বরধ্বনি কখনো ব্যঞ্জনধ্বনির বাড়তি প্রয়োগ তারা তা অজান্তেই করে থাকে যথা ঘর শত্রু বিভিষণ>ঘরের সত্তুর বিবিসন।

১৩. যে দিনছ্যে সিতায় সিন্দুর সে আস্যে নাই লিত্যে / আমার রং লাগ্যে নাই যেত্যে। (আদরী বাউরি, মচড়াকেন্দ, রামচন্দ্রপুর, মেজিয়া)

বাংলার গ্রামীণ বধূরা স্বামীর শব্দ বা নামের পরিবর্তে ব্যবহার করে থাকে - 'যে', 'সে' দুটি ধ্বনি। এগুলি সর্বনামপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১৪. লাগিস না লেগ্যে যাব্য শিয়াকুলে বাদাড়ে দুব্য। (অলকা বারিক, বাকতোড়, তালডাংরা)

গ্রাম্য নারীর সহজাত প্রবৃত্তি কোন্দল করা। তাই তারা আদর-সোহাগ-মান-অভিমান-রাগ-দুঃখ প্রতি পদক্ষেপেই তাদের অনুভূতিগুলি প্রকাশ করে 'কোন্দলের' মাধ্যমে।

১৫. আঁশচে তুমার কালাচাঁদ / ঘুরাই ফিরাই মাথা বাইন্দ। (সাবিত্রী হাজরা, হরিডিহি, গুন্নাথ, ইন্দপুর)

রূপসজ্জা বা সৌন্দর্য্যচর্চা নারীর সহজাত প্রবৃত্তি। যার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় গৃহে স্বামী আসার জন্য স্ত্রীর কেশ সজ্জা। প্রবাদটি নারী কণ্ঠ থেকে নেওয়া।

১৬. ওলো গিদারি বিটি / মাটির ঘর আর ভাতার আছে সবারই। (আদরী বাউরি, মচড়াকেন্দ, রামচন্দ্রপুর, মেজিয়া) অথবা, মা গ মা তাল পিঠ্যা খাব / দুর দুর খেরানির বিটি / তাল কুথায় পাব। (হীরারানি মণ্ডল, বড়জোড়া)

পুরুষ ও নারীর 'ব্যাখান' বা গালাগাল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। গিদারির বিটি বা খেরানির বিটি সম্পূর্ণ গ্রাম্য নারীর গালাগাল বিশেষ। যা একমাত্র গ্রাম্য নারীরা ভাষায় ব্যবহার করে।

১৭. বান্দরের গলাই মুইকতার মালা। (সিদ্ধার্থ দত্ত, অমরকানন, গঙ্গাজলঘাটি)

শব্দগুলিকে সহজ সরল করা হয়েছে উচ্চারণের সুবিধার্থে। গ্রাম্য অশিক্ষিত বধূরা জিহ্বার আড়ষ্ঠতার জন্য ব্যঞ্জনধ্বনিকে ভেঙে সহজ সরল করে নেয় স্বরভক্তি, সমীভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

১৮. মদ খালি হেথ্যা সেথ্যা / গামছ্যা হারালি কুথ্যা / গামছ্যা হারালি সেত লালাত্যে। (আদরী বাউরি, মচড়াকেন্দ, রামচন্দ্রপুর, মেজিয়া)

গ্রাম্য নিরক্ষর নারীরা ধ্বনি উচ্চারণের শেষে 'আ' বা 'অ্যা' ধ্বনির প্রয়োগ করে থাকে। পুরুষদের তুলনায় বেশিই করে থাকে।

স্বাভাবিক কথোপকথনে নারী কণ্ঠের কলকাকলি পেলব প্রকৃতির বা সুমধুর প্রকৃতির হয়ে থাকে। ধ্বনির উপর শ্বাসাঘাত পড়লে ধ্বনিগুলি অনেকটাই ছন্দযুক্ত সুরে চালিত হয়। আঁশ চে গত কালাচাঁদ ঘুরাই ফিরাই মাথ্যা বান্দ। আস শব্দের শ্বাসাঘাত পড়েছে তার পর ছন্দ ও সুর ব্যবহার করেছে। আঁশ চে এ এ এ কত কালাচাঁন্দ। ওল অ অ অ গিদারি বিটি ই ই ই। বর সেজেছ অ অ অ বেশ করেছ অ অ অ ।

পুরুষ কণ্ঠে প্রবাদ : নারী বা পুরুষের উদ্দেশ্যে :

লক্ষ্য করা যায় পুরুষ কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত প্রবাদগুলি বেশির ভাগ পুরুষ কেন্দ্রিক এবং জীবিকা কেন্দ্রিক। দ্বিতীয়ত : ঘরের বাইরের জগৎ সম্পর্কেই প্রবাদগুলি কথিত। গৃহের অন্তর্জগৎ সম্পর্কে যেমন মেয়েরা ওয়াকিবহাল, ঘরোয়া বিষয় সম্পর্কে তাদের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে প্রবাদগুলিতে। তেমনি চার দেওয়ালের বাইরে পুরুষদের জগৎ তাদের পৌরুষত্ব, পেশা, লাভ-ক্ষতির পরিমাণ, বিষয় বস্তুর ভাল-মন্দের দিক নির্দেশ করেছে প্রবাদে। তৃতীয়ত : তাছাড়া প্রবাদগুলি যে পুরুষদের কণ্ঠেই উচ্চারিত, তা তাদের উচ্চারণ ভঙ্গির দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। পুরুষদের ভাষা বেশ কর্কশ, রুক্ষ, কোমলতার ছাপ কোথাও নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার খাতিরে তারা একবারের বেশি একই বিষয় উচ্চারণ করতে চাই না। চতুর্থত : তারা 'ব্যাখান' বা 'গালাগালি' অতি সহজেই প্রকাশ করতে পারে। পঞ্চমত : প্রবাদ হল নারী কণ্ঠের আবেগ তাড়িতে প্রতিবাদ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা চাপা স্বরে মনের ভাব প্রকাশ করেছে প্রবাদের মধ্য দিয়ে। তাই পুরুষ কণ্ঠ থেকে খুব কম সংখ্যক প্রবাদ লক্ষ্য করা যায়।

১. ঘুরে বার বসে বার বুলে বার / তার মধ্যে তুমি যত কত্তে পার। (গুপী বাউরি, ঝাঁটিপাহাড়ী, ছাতনা)

প্রবাদটিতে শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থ উপার্জনের জন্য পরিশ্রমী হওয়া দরকার। ঘুরে, বসে, বুলে যত বেশি পরিশ্রম করবে (উপার্জনের জন্য) তত বেশি আয় হবে। প্রবাদটি একজন কুলি-মজুর,ঠিকা-মজুরের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত। পুরুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে পুরুষের উদ্দেশ্যে।

২. ঠিকাদারের খাটালি ধুড়ুক ধুড়ুক দৌড়ালি। (মনা বাউরি, গুপী বাউরি, ঝাঁটিপাহাড়ী, ছাতনা)

প্রবাদটি পুরুষ কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত ঠিকা-মজুর করে উপার্জন করার কথা আছে। জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামী মনোভাব প্রবাদটিতে দেখতে পায়।

৩. চাষে বড় রস / যদি থাকে মাপ দশ / যদি থাকে জন দশ। (লক্ষীনারায়ণ, মাকড়কোল, ওন্দা)

পুরুষ কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত প্রবাদটিতে চাষের লাভ-ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করেছেন। বক্তার নিজের জমিতে চাষ-আবাদ হয়ে থাকে।

৪.লইজ্যা বামুন কেইশ্যা চর / চাষি যদি হয় আমদ খর / বষ্টম খড়্যাঁ কায়েত মুখ্যু / এই পাঁচ শালারই সমান দুখখু। (শান্তি ভট্টাচার্য, ভড়া)

ভড়া নিবাসী একজন পেশায় ব্রাহ্মণ তার মুখ থেকে প্রাপ্ত প্রবাদটিতে ব্রাহ্মণ, চোর, চাষি, বোষ্টম, কায়েত এর পেশাগত স্বভাব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন।

৫. সরু সরু হাওয়া দিচ্ছে পুয়া বাগানে / তোর শালাদের ঘুম পাচ্ছে ভরা যৌবনে। (মধুসূদন ভূঁইয়া, বীরসিংহ, পাত্রসায়ের)

'শালা' শব্দের দ্বারা বোঝা যায় প্রবাদটি পুরুষদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

৬. বউ আমার রান্তে জানে নাই / কুলে বেগুনে / ফু দিয়ে মুখ পুড়ে গেল / তুষের আগুনে। (দেবদুলাল সু, নতুনগ্রাম, পাত্রসায়ের)

স্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বামীর উক্তি। প্রবাদটি পুরুষের গলা থেকেই প্রাপ্ত।

৭. খাচ্চে বিড়ি উড়চে ধুয়া / বসে আছে ছুঁচা মুয়া। (সুখেন মণ্ডল, মণ্ডলকুলী, রাইপুর)

উদ্দেশ্য এবং বক্তা পুরুষ। যদিও প্রবাদটি নারী কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়। ছুঁচা মুয়া, খাচ্চ বিড়ি, শব্দের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে পুরুষের উদ্দেশ্যেই কথিত।

৮. ট্যাকার কারণে ট্যাকার সুদ বেশি / ব্যাট্যার চ্যায়্যেঁ লাতি বেশি। (শ্রী সুনীল কুমার সিংহমহাপাত্র, হাতিরামপুর, খাতড়া)

অর্থের লাভ ক্ষতির পরিমাণ একজন বাস্তববাদী পুরুষের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা প্রবাদটির মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে।

৯. গরীব যারা রইল গরীর / তরা ভটভটি গিলা চাঁপাইলিলি। (সুদর্শন সেনগুপ্ত, মলিয়ান, হীড়বাঁধ)

তৎকালীন সমাজে গরীব বড়লোকের তারতম্য বোঝাতে প্রবাদটি কথিত। পেশায় একজন হোমিও ডাক্তার (প্রাকটিশরত) যিনি দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে।

১০. লাভের গুড় পিঁমড়াই খাই। (স্বপন কুমার দে, বাহাদুরগঞ্জ, বিষ্ণুপুর)

বক্তা একজন ব্যবসায়ী। যিনি লাভ-ক্ষতির পরিমাণ বোঝেন নিখুঁত ভাবে।

পরিশেষে বলা যায়, নারী-পুরুষের ভাষার বৈচিত্র্য চিহ্নানয়ণ করা সহজ-সাধ্য নয়। অঙ্গভঙ্গি, বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ও সম্ভব নয়, তা একান্ত নারী পুরুষের মানসিক দিক, সামাজিক দিক ও বটে। কারণ, এমন কোন ধ্বনি বা শব্দ হয় না যা কেবলমাত্র নারীদের ভাষায় ব্যবহৃত হয় বা পুরুষদেও ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলি নারী-পুরুষের একান্ত নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ।

বয়স ভেদে -

সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায় সমাজে বয়সের তারতম্যে ভাষা বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। নবীনরা যে ভাষায় কথা বলে প্রবীণরা সেই ভাষায় কথা বলে না। প্রাপ্ত বয়স্ক (যুবক/যুবতি) মানুষেরা সামাজিক মর্যাদা সূচক মান্য ভাষাকে সম্মান করে। শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির আচরণ সহ শিক্ষিত যুবকদের / যুবতিদের ঝোঁক থাকে মান্য ভাষার দিকে। সমাজে নবীনরা শিক্ষাগত যোগ্যতার দরুন বা চাকরি সূত্রে গ্রামের বাইরে বসবাস করে। আর্থ-সামাজিক মূল্যের তাগিদে শহরাঞ্চলের মান্য ভাষা-সমাজ-সাংস্কৃতিকে আয়ত্ত করে ফেলে। ফলে নবীনদের মুখে সেই গ্রাম্য ভাষা বা সংস্কৃতি ধরা পড়ে না। অপরদিকে প্রবীণরা রক্ষণশীলতার জন্য পুরানো শব্দকে আকড়ে ধরে রাখতে চায়। তৎকালীন সমাজে তুলনামূলক নবীনদের থেকে প্রবীণদের শিক্ষা-দীক্ষার হার কম বা একেবারে নেই বলা চলে। অর্থাৎ বাইরের যোগাযোগ ব্যবস্থা কম বা কখনো বয়স্ক মানুষেরা তাদের জীবন থেকে অবসর নিয়ে গ্রামেই বসবাস করে। তাই তাদের বহির্জগতের যোগাযোগ মাধ্যম অত্যল্প। এই জন্য নবীনদের ভাষার সাথে প্রবীণদের ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

আবার দেখা যায় বয়সের তারতম্যে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী মানুষের ভাষার উপর প্রভাব পড়ে। প্রান্তিক গ্রামাঞ্চল গুলিতে আজকাল এই ভাষার তারতম্য হচ্ছে। সদ্য নবীনরা স্কুল-কলেজের গণ্ডী পেরিয়ে গ্রামাঞ্চলের বাইরে যাচ্ছে চাকরি সূত্রে। তাদের দীর্ঘদিন যাবত্ বাইরে কাটাতে হচ্ছে। বর্তমানে প্রান্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতেও প্রায় সমস্ত শিশুরা শিক্ষা পাচ্ছে (বয়স ১-১৮), প্রায় প্রত্যেকটি

বাড়িতে ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা (মাধ্যমিক-অষ্টম শ্রেণী) পাচ্ছে। বাড়ির বাইরে আদব-কায়দায় পরিচালিত হচ্ছে। বেশ কিছু বাড়িতে কলেজের গণ্ডী পেরোচ্ছে সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধের তাগিদে মান্য-চলিত ভাষার দিকে ঝুঁকেছে। যদিও তারা বাড়িতে কথোপকথনের সময় তাদের গ্রাম্য ভাষার টানেই বা উচ্চারণ ভঙ্গিতে কথা বলে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শহরাঞ্চলের মতো, গ্রামাঞ্চলেও বয়স ভেদে ভাষা ভেদ হয়। দেখা যাচ্ছে ৩০-৪৫ বছর বয়সের মহিলা-পুরুষের কাছে গ্রামীণ ভাষায় প্রবাদগুলি পাওয়া যায়। তার থেকে অরো বেশি প্রবাদ পাওয়া যায় ৮০ বছর বয়সের মধ্যে পুরুষ-মহিলাদের নিকট যাঁরা জন্ম থেকে গ্রামেই আছেন, যারা মান্য ভাষা বা আদব-কায়দা থেকে শতহাত দূরে, তাদের কণ্ঠেই প্রাপ্ত প্রবাদগুলির সংখ্যা বেশি। প্রবাদে তাদের নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, বাকভঙ্গি, ভাষার টোন বা উচ্চারণগুলি টিকিয়ে রেখেছে বা রাখছে। গ্রামকে কেন্দ্র করে তাদের বেড়ে ওঠা গ্রামেই তাদের সীমাবদ্ধ জীবিকা (চাষবাস, কুটির শিল্প, কুলি-মজুর, ঠিকা-মজুর, ঝি-চাকর ইত্যাদি)। প্রবাদগুলিতে এখনো মান্য চলিত ভাষার প্রভাব পড়েনি। সেই সব মানুষগুলি এখনো সামাজিক মূল্যবোধের স্রোতে প্রভাবিত হয় নি বা ভেসে যায় নি। অপরদিকে ৩০ বছরের নীচে নবীনদের কাছে 'সাহিত্যিক মান্য ভাষার প্রবাদ' এর সংখ্যা বেশি। তাদের কাছে বাঁকুড়ার নিজস্ব শব্দভাণ্ডারের প্রবাদ প্রায়ই অজানা। পুঁথিগত প্রবাদগুলিই তাদের মুখে শোনা যায়। কখনো বা দু-একটি গ্রাম্য ভাষায় প্রেমের ছড়া বা কবিতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। সামাজিক মূল্যবোধের চাহিদার ঝোঁক তাদের কাছে বেশি। গ্রাম্য ভাষাকে তাচ্ছিল্য রূপে দেখছে ফলে তাদের মুখ দিয়ে দু-একটি গ্রাম্য প্রবাদ খুব কষ্ট করেই উচ্চারিত হয়। বর্তমান ভাষাভাষীদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রবাদগুলি তাদের মুখে আর উচ্চারিত হবে না, প্রবাদগুলি লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রচণ্ড। বাঁকুড়ার পরবর্তী প্রজন্মে বাঁকুড়ার কথ্য 'প্রবাদ'গুলি শূণ্যগর্ভ হয়ে উঠবে।

৪৬-৮০ বছর বয়সের প্রবাদ :

১. লারি না পারি কথায় ক্যান্যে হারি। (সুধীর দত্ত, বয়স-৭৫, কেঞ্জাকুড়া)

কর্মে অসমর্থ হলেও তর্কে বহুদূর। ৭৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন বক্তা প্রবাদে সেই উপলব্ধিটি প্রকাশ করেছে। যে কোন কিছুই পারে না কিন্তু কথায় তাকে হারাতে পারেনা অর্থাৎ তার কাজের থেকে মুখ চলে বেশি। তাকে কথায় কেউ পরাজিত করতে পারে না।

২. রিসকার গাড়ি ফ্যাইস্যে গেল্য / ত্যাল দিল্যে খলা চাঁইট্যে গেল্য। (কপ্পুরা বাউরি, বয়স-৬৫, ছাতনা, ঝাঁটিপাহাড়ী)

বক্তা একজন ৬৫ বছরের মহিলা। একজন মহিলা অপর একজন মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে। রিক্সার চাকা যেমন পাঙচার হয় তেমনি পাত্রে তেল দেওয়ার সাথে সাথে পাত্রটি তপ্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রবাদটি ধৈর্য্যহীন মহিলাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়।

৩. চুল লিয়্যেঁ কি বিছাই শুব্য / রূপ লিয়্যে কি ধুয়্যে খাব্যঁ। (গুপী বাউরি, বয়স-৬৫, ছাতনা)

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র বলা হলেও গ্রাম বাংলার মানুষেরা রূপের থেকে গুণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কারণ, নববধূ সংসারে কাজকর্ম করবে শাশুড়ির নিকট এটাই কাম্য। অথচ রূপবতী নববধূ সংসারে কুটোটি নাড়ে না সেই রকম নারী সংসারে পরিত্যাজ্য। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৃদ্ধার নিকট এই প্রবাদটি গৃহীত হয়েছে।

৪. ওলো গিদারি বিটি / মাটির ঘর আর ভাতার আছে সবারই। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, মেজিয়া)

গ্রাম বাংলায় হিন্দু নারীকে 'বিবাহ' দিতেই হয়। প্রত্যেক নারীর একটি সহজাত প্রবৃত্তি তার শ্বশুর বাড়িতে স্বামী সংসার নিয়ে সুখে সংসার করা। তাই তাতে অহংকার করার কিছু নেই। একজন ৭০ বছরের বৃদ্ধার নিকট প্রবাদটি সংগৃহীত। কলহপরায়ণ অহংকারী নারীর উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে।

৫. আইজ ক্যাল কাপড় ভাল্য তাই দুখখু পাই / আর সকাল বেলায় রেইন্দ্যে বেড়ে সইন্দ্যে বেলাই খাই। (পোস্ত, বয়স-৬০, দুর্লভপুর, মেজিয়া)

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছল পরিবারে এক কাপড়ে একবেলা আহার করে দিন যাপনের কথা দুঃখ ভরা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ৬০ বছরের অবিবাহিতা নিরক্ষর মহিলার নিকট।

৬. কখনো নাই ভাজা খুঁজ্যা / মিন পরব্যে দুগ্‌গা পূজা। (লক্ষ্মী বাউরি, বয়স-৭৮, ঘটক গ্রাম, মেজিয়া)

যে কৃপণ ব্যক্তি অপরের জন্য কোন দিন টাকা-পয়সা খরচ করেনি সে আবার অসময়ে অনেক টাকা খরচ করে দুর্গা পূজা করে। কৃপণ ব্যক্তির অসামঞ্জস্য কাজকে দেখে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ উক্তিটি করেছে।

ভাজা খুঁজ্যা অর্থাৎ খইঢ্যারা। এই পার্বনে ৮/১০ রকমের ভাজা শস্য খাওয়ার রীতিটি লক্ষ্য করা যায়।মিন পরবের অন্তর্নিহিত অর্থটি হল নিজের ইচ্ছা মতো সময় বা অসময়।

৭. ভিক্কার চাল কাঁড়া না আকাঁড়া। (লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জ্জী, বয়স-৭৫, মাকড়কোল, ওন্দা)

ভিক্ষার চালের বিচার চলে না। আকাঁড়া চালের পরিমাণ বেশি থাকলেও নির্দ্বিধায় আহার করতে হয়। ৭৫ বছরের একজন বৃদ্ধ দরিদ্র পরিবারে আর্থিক অবস্থার কথা ফুটিয়ে তুলেছে।

৮. পেন্দা মিঞা খুঁজে গোল। (ইলা চক্রবর্তী, বয়স-৬০, মাকড়কোল,ওন্দা)

অতিরিক্ত কথা বলা নারীরা সমাজে গুরুত্ব পায় না। প্রবাদে সেই সব নারীদের কথা বলা হয়েছে। একজন বয়স্কা নারীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল প্রবাদটি।

৯. মা গ মা তাল পিঠ্যা খাব / ওলো খেরানির বিটি তাল কুথায় পাব। (হীরারানি মন্ডল, বয়স-৭০, বড়জোড়া)

দরিদ্র গ্রাম্যবধূর নিকট কন্যার আবদার পূরণ করতে না পারার যন্ত্রণায় কন্যাকে 'খেরানির বিটি ' বলে গালাগাল করে মনের যন্ত্রণা লাঘব করেছে। হীরারানি মণ্ডল (বয়স-৭০) এর নিকট পাওয়া প্রবাদটিতে মা-মেয়ের সুমধুর সম্পর্কটি ফুটে উঠেছে।

১০. এত করে করি ঘর / তবু মিইনসে বাসে পর। (রবীন্দ্রনাথ সীট, বয়স-৭৫, বড়জোড়া)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা সর্বদা অবহেলিত। স্ত্রী নিজেকে কায়মনবাক্যে স্বামীর চরণতলে সমর্পণ করলেও পরস্ত্রীকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দীর্ঘদিন সংসার জীবন কাটিয়ে আসা বৃদ্ধর নিকট উক্তিটি গৃহীত হয়েছে।

১১. কি আমার ভাব ভক্তি / পথ ছেড়ে দাও ঘর যাচ্চি। (বাউরি চরণ খাঁ, বয়স-৬৫, বড়জোড়া)

যে পরিবারের সাথে ভাব নেই, ভক্তি শ্রদ্ধা নেই সেইরকম পরিবারে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রবাদে সেই কথাই বলেছেন বৃদ্ধ বাউরি চরণ খাঁ।

১২. সব শালাকে ল্যার‍্যে প্যার‍্যে / বড়্যাঁ শালাকে ধর। (বিধান মুখার্জ্জী, বয়স-৫০, শরৎপল্লী, বাঁকুড়া)

অন্যায় ভাবে গজিয়ে ওঠা মানুষের পতন অনিবার্য। সময়ের সাথে সাথে অসৎ মানুষটিকে উচ্ছেদ করতে পিছপা হয় না। 'বোঁড়া' অর্থাৎ অসৎ মানুষটিকে বোঝানো হয়েছে।

১৩.ঘেঁষা ঘেঁষি বাস / দেখাদেখি চাষ। (অলক দে, বয়স-৫৫, কোতুলপুর)

উপযুক্ত আলো-বাতাস যেমন বসবাসের পক্ষে উপযোগী তেমনি অভিজ্ঞতালব্ধ চাষিরাও ফসল উৎপাদনে পারদর্শী হয়। গ্রামবাংলার চাষি পরিবারের গৃহবধূর মুখে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে।

১৪. মা গ মা তোর জামাই এসেচে / চিংড়ি মাছের খালায় করে গয়না এনেচে / ও গয়না লুব নাই / দিদির বিয়া দুবনাই। (আরতি বাজ, বয়স-৮০,জয়পুর)

দিদি এবং ভাইয়ের সুমধুর সম্পর্কটি চিরকাল আদৃত। একজন ৮০ বছরের নিরক্ষর বিধবা বৃদ্ধার নিকট প্রবাদটি গৃহীত হয়েছে।

১৫. নাইক মাগীর খাইক বেশি / নির্ধনা মাগীর গরব বেশি। (মিলনবালা দে, বয়স-৬৮, সোনামুখী)

হিন্দু সমাজে দরিদ্র নারীর অহংকার করা যেমন বৃথা তেমনি দরিদ্র নারীর অতিরিক্ত আহার নিন্দনীয়। একজন ৬৮ বছরের দরিদ্র বিধবার নিকট দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠেছে প্রবাদটিতে।

১৬. শিখে ছিলম রং রং কালে / ভুলে গেছি মহাজঞ্জালে। (পূর্ণিমা ভুঁইয়া, বয়স-৭০, পাত্রসায়ের)

বাপের বাড়িতে শিখে আসা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা সংসারের চাপে ভুলতে শুরু করে। নারী মনের গোপন হাহাকারটি ফুটিয়ে তুলেছে। একজন সাংসারিক চাপে জর্জরিত বৃদ্ধার নিকট প্রবাদটি গৃহীত।

১৭. দিন গেল হাল্যে হুল্যে / রাতের পঁন্দে বাতি জ্বলে। (বেলা ভুঁইয়া, বয়স-৬৯, পাত্রসায়ের)

ডনরক্ষর ভাগচাষি নারীর মুখে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে। নিরক্ষরতার জন্য ভাষা মার্জিত নয়। সময়ের শেষে সমস্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রবণতা থাকে। সেই সমস্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে।

১৮. শিখলি কুথায়, ঠকলি কুথায়। (দুলাল মন্ডল, বয়স-৮২, খাতড়া)

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় জানতে পারি, মূর্খেরা সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে তাই তাদের পক্ষে ঠকে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মূর্খেরা ঠকেও শিখতে পারে না। তারা বারবার ঠকে। ৮২ বছরের বৃদ্ধ প্রবাদটিতে প্রত্যক্ষ সত্যতা তুলে ধরেছে।

১৯. না বইল্ল্যে শুনবি কি কইর‍্যে। (লক্ষণ দাস, বয়স-৬৩, খাতড়া)

দীর্ঘদিনের লোকশ্রুত বাহিত প্রবাদটিতে লোকশিক্ষার মাধ্যমে জানাতে পারি, সংযত স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। মনের কথা বহিঃপ্রকাশ না করলে অপরের নিকট বক্তব্যটি অজ্ঞাত রয়ে যায়। তাই সবকিছু শোনা নয়, প্রয়োজনে কথা বলাও দরকার। প্রবাদটি ৬৩ বছরের বৃদ্ধর নিকট সংগৃহীত।

২০. গাছে মৌ তলায় খালা। (মানিক মণ্ডল, বয়স-৭২, খাতড়া)

দীর্ঘ অপেক্ষার অন্তনেই। গাছের মধু কখন পড়বে তার জন্য পাত্র বা খালা পেতে অপেক্ষা করা।

২১. যদি জানথম হিং দিয়ে রাইনথম। (হরিমতি দেশমুখ, বয়স-৪৫ উর্ধ্বে, খাতড়া)

তৎকালীন হিন্দু বাঙালি পরিবারে অতিথি আপ্যায়ণের একটি বিশেষ রীতি ফুটে উঠেছে একজন ৫৫ বছরের গৃহবধূর নিকট।

২২. এতটুকুন ফুঁকার‍্যে এঁড়্যা গরু হাঁকার‍্যে। (সাবিত্রি হাজরা, বয়স-৫৫, ইন্দপুর)

প্রবাদটি বাংলা মধ্যবিত্ত জীবনে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল। সন্তানের ব্যবহারে পিতা অসহ্য হয়ে পিতৃদায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক যখন তিক্ততায় পর্যবসিত হয় তখন উক্ত প্রবাদটি বলে থাকে।

২৩. লালায় লালায় জল যাচ্ছে / চিংড়ি মাছে কুক দিচ্চে। (সুন্দরী দাস মন্ডল, বয়স-৭০, রাইপুর)

পুকুরের চাষ করা চিংড়িমাছ ও নালার জলে বেয়ে আসা মাছ চাষের প্রক্রিয়াটি বিবৃত করেছে একজন অভিজ্ঞ চাষি পারিবারের বৃদ্ধা নারীর মুখে।

২৪. পরজুল দ'য়ের একগলা জল্যে / তোখে দেখব লো তল্যে তল্যে। (জয়দেব চক্রবর্তী, বয়স-৫৮, সীমলাপাল)

যে অপরের অনিষ্ঠ করে তারও খারাপ সময় ফিরে আসে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ৫৮ বছরের বয়স্ক মানুষের কাছে প্রবাদটি গৃহীত।

২৫. চরের মন পুঁই খাঁড়া। (রামসত্য সিংহ মাহাপাত্র, বয়স-৭০, সারেঙ্গা)

পুঁইশাক সেদ্ধ হলেও ডাঁটা খুব সহজে গলে যায় না, সতেজ ও শক্ত থাকে। তেমনি চোরের মন সর্বদা সর্তক থাকে ।

২৬. দাদা থেকে দাদু হয় / চুল দাঁড়ি পাইকল্যে / ঘরের বউ সুখী হয় শাশুড়ি না থাকল্যে। (ভাদুমণি, বয়স-৬২, তালডাংরা)

দৈনন্দিন জীবনে শাশুড়ি-বধূর তিক্ত অভিজ্ঞতাটি একজন বৃদ্ধার মুখে উচ্চারিত হয়েছে।

২৭. ক্যান্দ গাছে ক্যাল্ল্যাই ট্যা। (শ্যামলী দে, বয়স-৫৫, বিষ্ণুপুর)

কেন্নো লাল রঙের হয় কেন্দু গাছের কাণ্ড কালো রঙের হয়। কালো কাণ্ডের উপরে লাল রঙের কেন্নো বৈপরিত্য সৃষ্টি করে। সেই রূপ কালো মানুষের গায়ে উজ্জ্বলবর্ণের পোশাক পরিহিতা নারী বা পুরুষকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়ে থাকে।

২৮. ক্যাঙ্গলাস্যের দোড় রন্দগড়া। (স্বপন কুমার দে, বয়স-৬৩, বিষ্ণুপুর)

প্রাণী জগতের সীমাবদ্ধ জীবনের কথা প্রবাদটিতে ঘোষিত হয়েছে।

৩০-৪৫ বছর বয়েসের প্রবাদ -

১. বাপে জানে নাই লেইখ্যা পড়্যা / ছেল্যা পঁন্দে দিয়েছে দুট্যা কাগজ ছেঁড়্যা। (বীনা কেওড়া, বয়স-৪৫, দুর্লভপুর)

অতীতে লোকশিক্ষাই ছিল প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র আধার। পুঁথিগত শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুচ্ছ বা হেয় করে লোকশিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন মধ্যবয়সী একজন সন্তানের মা।

২. থাকরে কুকুর আমার আশে / ভাত দুব তখে পোষমাসে। (বনলতা সু, বয়স - ৪০, পাত্রসায়ের)

দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষগুলিকে পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে কার্য সিদ্ধি করে নেয়। অর্থাৎ কুকুরকে খাবারের লোভ দেখিয়ে অপেক্ষায় রাখে। প্রবাদটি মাঝবয়সী ভদ্রমহিলার নিকট গৃহীত।

৩. কুথাউ কিছু নাই ফফর দালালি। (পূর্ণিমা দেশমুখ, বয়স-৩৮, খাতড়া)

যে মানুষ কাজের থেকে কথা বেশি বলে অর্থাৎ যার বাহ্যিক আড়ম্বর বেশি অথচ অন্তঃসার শূন্য সেরূপ ব্যাক্তিকে উদ্দ্যেশ্য করে প্রবাদটি বলে থাকে।

৪.খাচ্চে এলাচ লং দিয়ে পান / সে কি ভাঙব্যেক আমার ধান। (মিতালি ঘোষ, বয়স-৩২, খাতড়া)

অকর্মন্য কোন নারীকে বলা হয়েছে। একজন নারীর উদ্দ্যেশ্যেই এই প্রবাদটি আলোচিত।

৫. আসকাটি খাস ফর গুনুস নাই। (কাজল ঘোষ, বয়স-৪০, খাতড়া)

অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে ইতু বিসর্জনের দিন প্রসাদ হিসাবে আঁশকা পিঠে বানানোর প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেছেন পরিবারের কর্তা। রঙ্গরসিকতা করে আঁশকে পিঠে খাওয়ার সময় প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে।

৬. লালার পাখ লালায় চর‍্যে / ঘুরে ঘুরে তার পেটট্যা ভর‍্যে। (মালাদাস মন্ডল, বয়স- ৩৫, রাইপুর)

ধাঁধা হলেও প্রচলিত প্রবাদে পরিণত হয়েছে। পাখ অর্থাৎ পাখি। নালা অর্থাৎ খনন করা আল বরাবর জল বেয়ে যাওয়া সরু নালা। প্রবাদটির অন্তর্নিহিত অর্থ হল নালার জলের পোকামাকড় খেয়ে মাছেরা বেঁচে থাকে।

৭. বউটি যেমন, তেমন কই / জলের ভিতর ভাইজত্যে জানে খই। (উমা কেউড়া, বয়স-৪২, খাতড়া)

সংসারে শাশুড়ি-বধূর তিক্ত সম্পর্কটিকে তুলে ধরেছে একজন ৪২ বছরের গৃহবধূ।

৮. জলট্যা হ্যড়কাচ্ছে / ভাতট্যা ভ্যড়কাচ্ছে। (ঠাকুরদাস রায়, বয়স-৪৫, সিমলাপাল)

জল বালতি থেকে উপছে পড়ছে এবং ভাতের ফ্যান উথলে পড়ছে। অর্থাৎ সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ প্রবাদগুলি ৪৫-৮০ বছরের বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদের কণ্ঠে নিঃসৃত। ৪৫ এর নীচে বয়স তাদের নিকট থেকে অতি অল্প সংখ্যক প্রবাদ সংগৃহীত হয়েছে। ৩০ এর নীচে বয়স যাদের তাদের নিকট কোন বাঁকুড়ার নিজস্ব প্রবাদই সংগৃহীত হয়নি।

জাতি ভেদে -

বাঁকুড়া জেলায় জাত-পাতের বৈচিত্র্য রয়েছে সর্বাধিক। বাঁকুড়ার প্রান্তিক এলাকার অভ্যন্তরে জাত-পাত কুসংস্কারের প্রভাব যত্রতত্র, কারণ সেখানে শিক্ষার স্রোত প্রবেশ করতে পারেনি, তাদের মনে ও প্রাণে। তাই উচ্চজাত এবং নিম্নজাতের প্রভেদটি যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ভাষারও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাঁকুড়ার প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনীয় স্কুল-কলেজ না থাকায় শিক্ষা-দীক্ষার অভাব এবং শহরাঞ্চলগুলি থেকে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গ্রাম গুলিতে জাত-পাতের শ্রেণী বিভাজন প্রভূত লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সঠিক শিক্ষা এবং জীবনধারার অভাবে শ্রেণী বিভাজনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জাতিভেদে স্তর হিসাবে উচ্চজাত-(ব্রাহ্মণ শ্রেণী), মধ্যজাত (অনগ্রসর জাতি), নিম্ন জাত (তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতি) তিনটি জাতি লক্ষ্য করা যায়। তবে বিভেদটি গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণ জাতি এবং অনগ্রসর জাতির (মধ্য জাত) সাথে নিম্নজাতের মানুষের (হাঁড়ি, মুচি, মেথর, বাউরি, শুঁড়ি ইত্যাদি)। মধ্যম জাত বা অনগ্রসর শ্রেণী, উচ্চজাত হিসাবে ঠাঁই না পেলেও উচ্চজাতের মতো আচার-আচরণ ব্যবহার শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া নয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য জাতের সাথে নিম্নজাতের পার্থক্য লক্ষ করা যায় ভাষায় ও মননে। বাঁকুড়া শহরাঞ্চল বা শহরতলী অঞ্চলগুলিতে নিম্নজাতের মানুষদের কোণঠাসা করে রেখেছে। নিম্নজাতের মানুষেরা অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে পরিগণিত। তাদের ছোঁয়া, নাড়া, খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থান থেকে শতহাত দুরত্বে থাকে উচ্চ জাতের মানুষেরা। কারণ তারা ব্রাত্য শ্রেণীর মানুষ। উচ্চজাতের মানুষেরা বেশির ভাগ পাকা-বাড়িতে বসবাস করে, খাদ্যাভ্যাস বা বাসস্থানের সাথে সাথে জীবনযাত্রার তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি।এদের উপার্জনের রাস্তা কুলি-মজুর, ঠিকা-মজুর, লোকের দোকানে কর্মচারী (পুরুষ), লোকের বাড়িতে ঝি (মহিলা), রাজমিস্ত্রির কাজ, চাষের কাজে ঠিকা-মজুর, ভাগচাষি, জালবোনা, বিড়ি তৈরী, বাঁশের আসবাবপত্র, পাতা সেলাই, খালা তৈরী, ইত্যাদি কুটির শিল্প। তাদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব। উচ্চবর্ণের মানুষেরা স্কুল-কলেজের গন্ডী পার হওয়ায় তাদের আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা-ভাষার সাথে নিম্নবর্ণের পার্থক্য বহুলাংশে লক্ষ্য করা যায়। উচ্চবর্ণের ভাষায় মান্য মার্জিত প্রভাব এনেছে। যদিও উচ্চারণ ভঙ্গি মান্য চলিত ভাষা থেকে অনেকাংশ পৃথক। শিক্ষা,দীক্ষা, পেশা, অর্থনৈতিক, সামাজিক মর্যাদা থেকে তাদের ভাষার প্রভেদটি লক্ষ্য করার মতো। মানুষগুলির অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, ভাষার রক্ষণশীল মনোভাব ছাড়াও শিক্ষা, পেশা, অর্থনৈতিক, সামাজিক মর্যাদার প্রেক্ষিতে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের ভাষার প্রভেদটি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিতহয়।

উচ্চ জাতের কণ্ঠে প্রবাদঃ

১. সেই পলাশের তিন পা। (চক্রবধ দত্ত, জাতি-বেনে, সপ্তম শ্রেণী, কেঞ্জাকুড়া)

অতীত ও বর্তমানে পলাশ ফুলের তিনটি পাপড়ির অবস্থানের পরিবর্তন নেই তেমনি অতীত এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থারও কোন পরিবর্তন হয়নি অল্প শিক্ষিত হলেও বেনে জাতের মানুষটি সময় এবং সমাজকে চিনে নিতে ভুল করেনি।

২. ল্যাঠার উপর ল্যাঠা দেবতার মার। (চক্রবধ দত্ত, জাতি-বেনে,সপ্তম শ্রেণী, কেঞ্জাকুজ)

জাতিতে বেনে, সপ্তম শ্রেণীতে পড়া চক্রধর দত্তের মুখে উচ্চারিত প্রবাদটিতে বলা হয়েছে প্রকৃতির অত্যাচার, দেবতার অত্যাচার, সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পরিশ্রমী চাষিদের কণ্ঠে বেদনার সুরটি ঘোষিত হয়েছে।

৩. রূপের ঘরে সুখের বাসা। (লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্খার্জ্জী, জাতি-ব্রাহ্মণ, এম.এ, ওন্দা)

মুখই মনের দর্পণ — প্রবাদটিতে রূপকে প্রাধান্য দিয়েছে। যে গৃহে সুন্দরী রমনী থাকে সেই গৃহ সুখী হয়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারের শিক্ষিত বৃদ্ধর মুখে উচ্চারিত হয়েছে।

৪. চাষে বড় রস / যদি থাকে মাপ দশ / যদি থাকে জন দশ। (লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্খার্জ্জী, জাতি-ব্রাহ্মণ, এম.এ, ওন্দা)

পরিবারের ব্রাহ্মণ বংশের সন্তানের মুখে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ছাপ প্রকাশ পেয়েছে প্রবাদটিতে। চাষ লাভজনক পেশা যদি ২০ বিঘা জমিতে দশ জন, জনমজুর খাটে।

৫. ভাল করতে চাই গ মনে / মন্দ হয় আমার কপাল গুণে। (রবীন্দ্রনাথ সীট, জাতি-তাঁতি, নিরক্ষর, বড়জোড়া)

নিষ্ঠুর সমাজের পরিস্থিতিতে অশান্তির সৃষ্টি হলে নারীরা তাদের নিজ ভাগ্যকেই দায়ী করে — তারা নিজেকেই দোষারোপ করে। জাতিতে তাঁতি, একজন বৃদ্ধর মুখে নারী মনের হাহাকারটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

৬. সুত্যা বেড়ান জাত / লতা বেড়ান গাছ / দুই সমান। (সিদ্ধার্থ দত্ত, জাতি-কায়স্থ কলেজ অধ্যাপক, অমরকানন)

একটি বড় গাছকে অবলম্বন করে পরজীবী লতা বেঁচে থাকে তেমনি একটি বংশ থেকে হাজার বংশ বৃদ্ধিপাই। প্রত্যেকটি সম্পর্কের সাথে প্রত্যেকটি সম্পর্ক জড়িত হয়ে থাকে। জাতিতে কায়স্থ অধ্যাপক সিদ্ধার্থ দত্তের নিকট অভিজ্ঞতাটি প্রকাশ পেয়েছে।

৭. সব শালাকে ল্যাব্যে প্যাব্যে / বঁড়্যা বেট্যাক্যে ধর। (বিধান মুখার্জী, জাতি-ব্রাহ্মণ, শালডিহা কলেজের অধ্যাপক, বাঁকুড়া)

শহরাঞ্চলে অবস্থিত বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ডঃ বিধান মুখার্জ্জীর অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝিয়ে দিতে অসুবিধা হয়না। সমস্যার মূল বা প্রধানকে সময়ের সাথে সাথে উচ্ছেদ করতে হয় প্রবাদটিতে তারই ঈঙ্গিত দিয়েছেন।

৮. ঘেঁষা ঘেঁষি বাস / দেখা দেখি চাষ। (অলক দে, জাতিতে-কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষক, কোতুলপুর)

পারিবারিক চাষ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, একজন জাতিতে কায়স্থ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের কণ্ঠে উক্ত প্রবাদটি ফুটে উঠেছে। ঘেঁষা ঘেঁষি বসবাস যেমন অনুপোযুক্ত তেমনি অভিজ্ঞতাহীন চাষও উপযুক্ত নয়।

৯. ব্রাহ্মণকে গরু দান এক চোখ তার কানা .....। (অলক দে, জাতিতে-কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষক, কোতুলপুর)

সমাজে উচ্চ বর্ণ হল ব্রাহ্মণ। জাত-পাতের ভয় না পেয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চবর্ণের প্রাধান্যকে লুপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রবাদে। ব্রাহ্মণকে হেয় করা হয়েছে।

১০.গান মান জানি না / খায় পান দক্তা / মাগ ভাতারে শুয়ে আছে হেত্তা হত্তা। (পরেশনাথ কর্মকার, জাতিতে-কামার,সরকারি কর্মচারী, সোনামুখী)

গ্রাম্য বাংলায় স্বামী-স্ত্রীর সুখী সংসারে গান-বাজনার আসর না বসালেও একটুকরো পান দক্তা খেয়ে খোলা ছাদের নীচে শুয়ে রঙিন জগতে হারিয়ে যেতে পারে। সরকারি চাকুরিজীবী, উচ্চজাতের মানুষের মুখে প্রবাদটি গৃহীত হয়েছে।

১১. কোদালে কুড়ুলে / মেঘ জমিলে / চাষিকে বলে বাগাগে হাল। (গণেশ সেন, জাতি-তাম্বুলি, ইন্দাস, রায়পাড়া, চাষবাস)

জাতিতে তাম্বুলি পেশায় চাষি পরিবারের কণ্ঠে উক্ত প্রবাদটি গৃহীত হয়েছে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চাষিরা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস পেয়ে কোদাল-কুড়ুল বাগিয়ে রাখার পরামর্শ দেয়।

১২. উপর থেকে পড়ে গেল দু-মুখা সাপ / যার যেথায় ব্যথা তার সেথায় হাত। (দেবদুলাল সু,জাতি-তাঁতি, নতুনগ্রাম, বীরসিংহ)

জাতিতে তাঁতি দরিদ্র পরিবারের গৃহকর্তার মুখে রাজনৈতিক দিকটিকে সুপষ্ট করেছে প্রবাদটির মধ্য দিয়ে। দু-মুখো মানুষের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হলে সমাজের চোখে মানুষটি নিন্দিত হয়। প্রবাদটিতে চতুর মানুষের সেই চতুরতার কথাটি ফুটে উঠেছে।

১৩. নাই মামাকে কানামামা। (কাজল ঘোষ, জাতি-গোয়ালা, B.A পাশ, খাতড়া)

জাতিতে গোয়ালা শিক্ষিত পরিবারের কণ্ঠে মামা-ভাগ্নের সুমধুর সম্পর্কটি উচ্চারিত হয়েছে। অন্তর্নিহিত অর্থ হল বেশি কিছু না থাকার চেয়ে কম থাকা ভাল। বাঁকুড়ার একটি মৌলিক প্রবাদ।

১৪. টিকটিকির দোড় মড়কাচা। (মিতলি ঘোষ, জাতি-গোয়ালা, B.A পাশ, খাতড়া)

উচ্চশিক্ষিত, কায়স্থ পরিবারের নারীর মুখে উচ্চারিত হয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের কথা। প্রত্যেক প্রাণীর জগতের নির্দিষ্ট সীমা থাকে, সীমা লঙ্ঘণ করলেই বিপদ। ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষটি দুর্বল মানুষটিকে সচেতন করে বলে থাকে।

১৫. ধরা কে সরা কে জ্ঞান করা। (মৌসুমি সিংহ মহাপাত্র, জাতি-কায়স্থ, নবম শ্রেণী, সারেঙ্গা)

যাদের পূর্বে কিছু ছিল না কিন্তু বর্তমান সমাজে মান-সম্মান-প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েছে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এই সব মানুষদের উদ্দেশ্যে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়। 'সরা' অর্থাৎ মাটির পাত্র।

১৬. চরের মন পুঁই খাড়া। (রামসত্য সিংহ মহাপাত্র, জাতি-কায়স্থ, পুলিশ কন্সটেবল)

চোরের মন সর্বদা সর্তক থাকে। পুঁইশাক সেদ্ধ হলেও ডাঁটা খুব সহজে গলে যায় না, সতেজ ও শক্ত থাকে। তেমনি, চোরের মন সর্বদা সর্তক থাকে।

নিম্ন জাতের কণ্ঠে প্রবাদ :

১. নিশি লাইগল নাই সরু দাঁত্যে / নিশি রইল আমার সানবান্দন ঘাট্যে। (কপ্পুরা বাউরি, জাতি-বাউরি, কাঠকুড়ুনি, নিরক্ষর, ঝাঁটিপাহাড়ী)

অবসর সময়ে ঘাটে গিয়ে সমস্ত সুখ-দুঃখের কথা বলে নারীরা। কিন্তু সংসারের জাঁতাকলে পড়ে শানবাঁধানো ঘাটে মিশি ফেলে চলে এসেছে। প্রবাদটি নারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

২. বিয়ায় খ্যায়্যেঁ ল্যে খ্যায়্যেঁ ল্যে নতুন ধানের চিঁড়্যা / আগলি ধারের জল ঘটিটা পিছলি ধারে পিঁড়্যা। (কপ্পুরা বাউরি, জাতি-বাউরি, কাঠকুড়ুনি, ছাগল চরানো কাজ, ঝাঁটিপাহাড়ী)

কপ্পুরা বাউরি, নিরক্ষর, পেশায় কাঠকুড়ানি, বাংলার নবান্ন উৎসবে নতুন ধানের চিঁড়া খাওয়ার রীতি এবং অতিথি আপ্যায়নের রীতিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন উক্ত প্রবাদটির মধ্য দিয়ে।

৩. ভাব কইর‍্যে ভাব রাইখলি নাই / ফুইট্যে গেল্য আমার বড়াল ধানের খই। (আদরি বাউরি, জাতি-বাউরি, লোকের বাড়িতে কাজ করে, নিরক্ষর, ঝাঁটিপাহাড়ী)

জাতিতে বাউরি নিরক্ষর মানুষগুলির সাংসারিক কাজ-কর্ম, পাড়া-প্রতিবেশী, পরিবারকে নিয়েই তাদের ভাবনা চিন্তার জগৎ অর্থাৎ গৃহের অভ্যন্তরেই তাদের বসবাস আমৃত্যু পর্যন্ত। যেমন সহ্যের সীমা লঙ্ঘণ করলে সম্পর্কে তিক্ততা আসে, সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়, তেমন বড়াল ধান তপ্ত হয়ে ফুটে খই হয়।

৪. তামুক খ্যায়্যেঁ দাঁত ক্যাল্য / লক্যে বল্যে আছ ভাল্য। (আদরি বাউরি, জাতি-বাউরি, লোকের বাড়িতে কাজ করে, নিরক্ষর, ঝাঁটিপাহাড়ী)

বাইরের জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, অশিক্ষত, নিম্নজাতের মহিলাদের স্থান গৃহের অভ্যন্তরে। কিন্তু অনভিজ্ঞ হলেও ধনী পরিবারের নারীরা তামুক খেয়ে দাঁত কালো করত। অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হলেও নারীরা ছিল অবহেলিত। নারী মনের গোপন হাহাকারটি প্রবাদে ফুটে উঠেছে।

৫. বাপে জানে নাই লেইখ্যা পড়্যা / ছেল্যা পঁন্দে দিয়েছে দুট্যা কাগজ ছেঁড়্যা। (বিনা কেউড়া, জাতি-কেউড়া, নিরক্ষর, স্কুলে রান্নার সাহায্যকারী, দুর্লভপুর)

জাতিকে কেওড়া নিরক্ষর নারীর কণ্ঠে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে। পুঁথিগত শিক্ষাকে তুচ্ছ বা হেয় করে লোকশিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

৬. মূলাখান্দির বিয়া হচ্ছে এই কত লয় / তার আবার দুপায়ে আলত্যা। (মিঠু সর্দার, জাতি-মেথর, নিরক্ষর, পাতা সেলাই করে, খাটুল)

প্রবাদটিতে খাঁদি মেয়ের শখ আহ্লাদকে পাড়া-প্রতিবেশীরা ব্যঙ্গ করেছে। নিচু জাতের নিরক্ষর, পেশায় পাতা সেলাই করা এক গৃহবধূর নিকট প্রবাদটি নেওয়া হয়েছে।

৭. দিন গেল্য আল্যে ঢাল্যে / রাইতের পঁন্দে বাতি জল্যে। (বাসন্তি সিং সর্দার, ভেড়া চাষ, নিরক্ষর, রানিবাঁধ)

ভাগচাষি নিরক্ষর নারীর মুখে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে। নিরক্ষরতার জন্য ভাষা মার্জিত নয়। সময়ের শেষে সমস্ত কাজ, সমাপ্ত করার প্রবণতা থাকে সেই সমস্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে।

৮. চইলত্যে ল্যার‍্যে বুড়ি কুচি পাথর‍্যে / দে বুড়িকে ট্যাসকি মটর‍্যে। (কপ্পুর বাউরি, জাতি-বাউরি, কাঠকুড়ুনি, নিরক্ষর, ঝাঁটিপাহাড়ি)

অস্বচ্ছল পরিবারে গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে যোগযোগের এক মাত্র মাধ্যম পথে হাঁটা পা। জাতিতে বাউরি নিরক্ষর বিধবা কাঠরাড়ানির মুখে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে। প্রবাদটি ব্যঙ্গ করে অস্বচ্ছল পরিবারের বৃদ্ধাকে বলা হয়ে থাকে।

৯. মূলাখান্দির বিয়া হচ্ছে সেই কত লয় / তার আবার ব্যাঙপায়ের বাজনা। (রিঙ্কু সহিস, জাতি-মেথর, বধূ, নিরক্ষর, বহড়ামুড়ি)

জাতিতে মেথর, নিরক্ষর, গৃহবধূর নিকট প্রবাদটি গৃহীত হয়েছে। আলোচ্য প্রবাদটিতে দরিদ্র পিতার শখ-আহ্লাদকে পাড়াপ্রতিবেশীরা ব্যঙ্গ করেছে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে পরিলক্ষিত হয় যে,

প্রথমতঃ উচ্চজাতের মুখে মান্য ভাষার প্রয়োগ যথেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ নিম্নজাতের মানুষেরা আত্মকেন্দ্রিক আবেক চিন্তা ভাবনা নিয়েই জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ উচ্চজাতের মানুষেরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বাইরের জগৎ সম্পর্কিত বেশির ভাগ প্রবাদগুলি পুরুষ কণ্ঠে গৃহীত।

চতুর্থত : অধিকাংশে প্রবাদগুলি নিম্নজাতের কাছে পাওয়া।

শিক্ষাভেদে -

সামাজিক স্তরবিন্যাসের শেষ স্তরটি হল শিক্ষা। সাক্ষর বা নিরক্ষর ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের বিভেদটি বিশেষ চোখে পড়ার মতো। সাক্ষর ও নিরক্ষর ব্যক্তির দুটি ভাষা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিভেদের প্রধান কারণ আর্থ-সামাজিক দিক, যার উপর নির্ভর করে ব্যক্তিটির শিক্ষাগত যোগ্যতা। বাঁকুড়া জেলার ভাষা বিভেদের সামাজিক স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে তিনটি শ্রেণী পাওয়া যায় — উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ভাষা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষা, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ভাষা। উচ্চবিত্ত মানুষেরা পেশায়বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তারা সরকারি কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত। তারা বড় ব্যবসার সাথে যুক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চাষ-বাস, রাজমিস্ত্রি কাজ, কুটির শিল্প, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। এদের বাসস্থান শহরের মধ্যবর্তী স্থানে হয়ে থাকে। বস্তুতঃ উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হয়ে থাকে। তাদের বাড়ির প্রায় প্রতিটি সদস্যই শিক্ষিত। এরা উচ্চ-শিক্ষিত। স্কুল-কলেজের শিক্ষা প্রাপ্ত বা কলেজের পরবর্তী শিক্ষাও পেয়েছে। বাড়ির প্রতিটি সদস্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছে। তাদের যোগাযোগ মাধ্যম, বাঁকুড়া শহরাঞ্চলের বাইরেও থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের ছেলে মেয়েরা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বা কলেজ অবধি শিক্ষা প্রাপ্ত। তাদের আয় বেশ ভাল। বাড়ির সদস্যরা (মহিলা,পুরুষ) উভয়ই শিক্ষিত। তাদের সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যয়ভারও বহন করতে পারে স্বচ্ছন্দে। অপরদিকে, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বৃত্তি হল — কুলি-মজুর, ঠিকা-মজুর, বাড়ির ঝি-চাকর, যে কোন কাজের শ্রমিক, সবজি বিক্রেতা ভাগচাষি, কাঠকুড়ানি, হাঁস-মুরগি-ছাগল চরানো। তাদের বাসস্থানগুলি বিশেষ চোখে পড়ার মতো। তারা গ্রামের প্রান্তেই বসবাস করে। সেখানে যোগাযোগ মাধ্যম বিছিন্ন। লোকালয় থেকে শতহাত দূরত্বে অবস্থান করে। আর এরা বেশির ভাগ তপশিল জাতি বা তপশিল উপজাতি হয়ে থাকে। খুব কম সংখ্যক পরিবারই শহরাঞ্চলের অবস্থান করে যাদের পরিবারের সদস্যরা শিক্ষিত বা চাকুরিজীবী। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা অনেকাংশে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী। কোন মতে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করে। তাদের আয় যেমন শূন্যের কোঠায় তেমনি শিক্ষার হারও প্রায় শূন্য। তাদের পরিবারের সদস্যরা শিক্ষিত নয়। খুব বেশি, চতুর্থ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা প্রাপ্ত। বেশির ভাগ বাড়ির গৃহবধূরা স্বাক্ষরটুকুও করতে পারে না। বেশির ভাগ মানুষই অশিক্ষিত। তারা 'টিপসই' ই অভ্যস্ত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা বেশির ভাগই নিরক্ষর। যদিও বর্তমানে এই সব বাড়ির শিশুরা পঠন-পাঠনের জন্য স্কুলে যাওয়া-আসা করছে। কিন্তু গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলে ৩০-৮০ বছরের পুরুষ

মহিলারা নিরক্ষরতার অতল অন্ধকারেই রয়ে গেছে। নিম্নে কয়েকটি প্রবাদের মধ্য দিয়ে নিরক্ষর ও স্বাক্ষর মানুষের ভাষার পার্থক্যটি তুলে ধরা হলঃ

স্বাক্ষর ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত প্রবাদ :

১. রূপের ঘরে সুখের বাসা। (লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্খার্জ্জী, এম.এ, ওন্দা) মুখই মনের দর্পণ — প্রবাদটিতে রূপকে প্রাধান্য দিয়েছে। যে গৃহে সুন্দরী রমনী থাকে সেই গৃহ সুখী হয়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারের শিক্ষিত বৃদ্ধর মুখে উচ্চারিত হয়েছে।

২. চাষে বড় রস / যদি থাকে মাপ দশ / যদি থাকে জন দশ। (লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্খার্জ্জী, এম.এ, ওন্দা)

পরিবারের ব্রাহ্মণ বংশের সন্তানের মুখে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ছাপ প্রকাশ পেয়েছে প্রবাদটিতে। চাষ লাভ জনক পেশা, যদি ২০ বিঘা জমিতে দশ জন জনমজুর খাটে।

৩. সুত্যা বেড়ান জাত / লত্যা বেড়ান গাছ / দুই সমান। (সিদ্ধার্থ দত্ত, কলেজ অধ্যাপক, অমরকানন)

একটি বড় গাছকে অবলম্বন করে পরজীবী লতা বেচে থাকে তেমনি একটি বংশ থেকে হাজার বংশ বৃদ্ধিপাই। প্রত্যেকটি সম্পর্কের সাথে প্রত্যেকটি সম্পর্ক জড়িত হয়ে থাকে। অধ্যাপক সিদ্ধার্থ দত্তের নিকট অভিজ্ঞতাটি প্রকাশ পেয়েছে।

৪. সব শালাকে লার‍্যে প্যারে / বড়্যাঁ শালাকে ধর। (বিধান মুখার্জ্জী, কলেজ অধ্যাপক, শরৎপল্লী, বাঁকুড়া)

অন্যায় ভাবে গজিয়ে ওঠা মানুষের পতন অনিবার্য। সময়ের সাথে সাথে অসৎ মানুষটিকে উচ্ছেদ করতে পিছপা হয় না। বোঁড়া অর্থাৎ অসৎ মানুষটিকে বোঝানো হয়েছে।

৫. ঘেঁষা ঘেঁষি বাস / দেখা দেখি চাষ। (অলক দে, প্রাথমিক শিক্ষক, কোতুলপুর)

জাতিতে কায়স্থ, পেশায় প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতায় প্রবাদটিতে সত্যতা যাচাই হয়েছে। বদ্ধ আলো বাতাস বসবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত তেমনি অনভিজ্ঞ চাষও ফসল ফলনে উপযুক্ত নয়।

৬. ব্রাহ্মণকে গরু দান এক চোখ তার কানা .....। (অলক দে, প্রাথমিক শিক্ষক, কোতুলপুর)

সমাজে উচ্চজাতের বর্ণ ব্রাহ্মণ। জাত-পাতের ভয় না পেয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চবর্ণের প্রাধান্যকে লুপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রবাদে। ব্রাহ্মণ জাতিকে হেয় করা হয়েছে।

৭. গান মান জানি না / খায় পান দক্তা / মাগ ভাতারে শুয়ে আছে হেত্তা হত্তা। (পরেশনাথ কর্মকার, সরকারি কর্মচারী, সোনামুখী)

পেশায় সরকারি চাকুরিজীবী, তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা আমরণ। গানের আসর না বসলেও পান দক্তা খেয়ে খোলা ছাদের নীচে শুয়ে রঙিন জগতে হারিয়ে যেতে পারে। বইরের জগৎ এর সাথে যোগাযোগ এবং শিক্ষিত হওয়ার জন্য ভাষার জড়তা নেই।

৮. উপর থেকে পড়ে গেল দু-মুখা সাপ / যার যেথায় ব্যথা তার সেথায় হাত। (দেবদুলাল সু, তাঁতি, নতুনগ্রাম, বীরসিংহ)

শিক্ষিত তাঁতি পরিবারের গৃহকর্তার মৃখে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে। দু-মুখো মানুষটির স্বরূপ জানতে পারলে সমাজের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। চতুর মানুষটির ব্যথিত চিত্তকে তুলে ধরেছে প্রবাদটিতে।

৯. নাই মামাকে কানামামা। (কাজল ঘোষ, B.A. পাশ, খাতড়া)

নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো অর্থাৎ কোন কিছু না থাকার চেয়ে অল্প কিছু থাকা ভালো।

১০. টিকটিকির দোড় মড়কাচা। (মিতলি ঘোষ, B.A. পাশ, খাতড়া)

প্রবাদে অন্তর্নিহিত অর্থটি সুস্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করেছে — সীমাবদ্ধতার হুমকি দিয়ে ক্ষমতা প্রবণ মানুষটি দুর্বল মানুষটিকে উদ্দেশ্য করে প্রবাদটি বলে থাকে।

১১. ধরা কে সরা কে জ্ঞান করা। (মৌসুমি সিংহ মহাপাত্র, নবম শ্রেণী, সারেঙ্গা)

যাদের পূর্বে কিছু ছিল না কিন্তু বর্তমান সমাজে মান-সম্মান-প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েছে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এই সব মানুষদের উদ্দ্যেশ্যে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়।

১২. চরের মন পুঁই খাড়া। (রামসত্য সিংহ মহাপাত্র, পুলিশ কন্সটেবল, সারেঙ্গা)

পুঁইশাক সেদ্ধ হলেও ডাঁটা খুব সহজে গলে যায় না, সতেজ ও শক্ত থাকে। তেমনি, চোরের মন সর্বদা সর্তক থাকে।

নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত প্রবাদ :

১. নিশি লাইগল নাই সরু দাঁত্যে / নিশি রইল আমার সানবান্দন ঘাট্যে। (কপ্পুরা বাউরি, কাঠকুড়ুনি, নিরক্ষর, ঝাঁটিপাহাড়ী)

নিরক্ষর বিধবা পেশায় কাঠকুড়ানির মুখে উচ্চারিত হয়েছে প্রবাদটি। সংসারের চাপে শান বাঁধানো ঘাটে নিশি ফেলে এসেছে। নিরক্ষর নারীদের লক্ষ করা যায় রান্নাঘরে, গোয়ালঘরে, বাড়ির সর্বত্র স্থানে এবং গৃহের বাইরে লক্ষ্য করা যায় স্নানের ঘাটে নারীদের সুখ-দুঃখের কথা আলোচিত হয়ে থাকে নিশি বা মাজন ব্যবহার করতে করতে।

২. বিয়ায় খ্যায়্যেঁ ল্যে খ্যায়্যেঁ ল্যে নতুন ধানের চিঁড়্যা / আগলি ধারের জল ঘটিটা পিছলি ধারে পিঁড়্যা। (কপ্পুরা বাউরি, কাঠকুড়ুনি, ছাগল চরানো কাজ, ঝাঁটিপাহাড়ী)

নিরক্ষর বিধবা কাঠকুড়ানির মুখে উচ্চারিত হয়েছে নবান্ন উৎসবে বাঙালি পরিবারের আদর-আপ্যায়ণ রীতিটি।

৩. ভাব কইর‍্যে ভাব রাইখলি নাই / ফুইট্যে গেল্য আমার বড়াল ধানের খই। (আদরি বাউরি, লোকের বাড়িতে কাজ করে, নিরক্ষর, ঝাঁটিপাহাড়ী)

প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে লোকের বাড়িতে কাজ করা, নিরক্ষর বিধবা বৃদ্ধার মুখে উচ্চারিত হয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে কলহে লিপ্ত হলে নারীরা উক্ত প্রবাদটি বলে থাকে। সহ্যের সীমা লঙ্ঘণ করলে সম্পর্কে তিক্ততা আসে, সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়। যেমন ভাবে বড়াল ধান তপ্ত হয়ে ফুটে খই হয়।

৪. তামুক খ্যায়্যেঁ দাঁত ক্যাল্য / লকে বলে আছ ভাল্য। (আদরি বাউরি, লোকের বাড়িতে কাজ করে, নিরক্ষর, ঝাঁটিপাহাড়ী)

প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে লোকের বাড়ির চাকরানির মুখে। নিরক্ষর, দরিদ্র বিধবার মুখে ধনী পরিবারের কথা উচ্চারিত হয়েছে। নিরক্ষর হলেও অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন গৃহিনীরা তামুক ব্যবহার করত।

৫. বাপ জানে নাই লেইখ্যা পড়্যা / ছেল্যা পঁন্দে দিয়েছে দুট্যা কাগজ ছেঁড়্যা। (বিনা কেউড়া, নিরক্ষর, স্কুলে রান্নার সাহায্যকারী, দুর্লভপুর)

স্কুলের রান্নার সাহায্যকারী নিরক্ষর নারীর মুখে প্রবাদটি গৃহীত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে লোকশিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

৬. মূলাখান্দির বিয়া হচ্ছে এই কত লয় / তার আবার দুপায়ে আলত্যা। (মিঠু সর্দার, নিরক্ষর, পাতা সেলাই করে, খাটুল)

পেশায় পাতার সেলাই করে, নিরক্ষর গৃহবধূর মুখে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে। কুৎসিত নারীর মনেও যে বিয়ের রঙ ধরে, শখ-আহ্লাদ জাগে তার কথা প্রবাটিতে বলা হয়েছে। প্রবাদটি ব্যঙ্গ করে কুরূপা মেয়েটিকে বলে থাকে।

৭. দিন গেল্য আল্যে ঢাল্যে / রাইতেই পন্দে বাতি জল্যে। (বাসন্তি সিং সর্দার, ভেড়াচাষ নিরক্ষর, রানিবাঁধ)

ভাগচাষি নিরক্ষর নারীর মুখে প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে। নিরক্ষরতার জন্য ভাষা মার্জিত নয়। সময়ের শেষে সমস্ত কাজ, সমাপ্ত করার প্রবণতা থাকে যে সমস্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে।

৮. কানা মাড় খাবি না নুন হাত্যে। (ফেলু কাপড়ি, ঠিকা-দার, ভাগচাষি, নিরক্ষর, খাতড়া)

পেশায় ভাগচাষি নিরক্ষর ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয়েছে প্রবাদটি। পাড়া-প্রতিবেশীর পারস্পরিক সু-সম্পর্কটিকে ব্যক্ত করেছে। আগ বাড়িয়ে প্রতিবেশী পরিবারের সুখ-দুঃখে সামিল হওয়ার কথা প্রবাদে প্রতিফলিত।

৯. মূলাখান্দির বিয়া হচ্ছে সেই কত লয় / তার আবার ব্যাঙপায়ের বাজনা। (রিঙ্কু সহিস, বধূ, নিরক্ষর, বহড়ামুড়ি)

একজন দরিদ্র পিতা তার আদরের কন্যাকে মহা আড়ম্বরে বিবাহ দেয়। একজন দরিদ্র পিতার আর্থিক অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করে প্রবাটি বলা হয়ে থাকে।

সমাজ ও ভাষাবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়।

প্রথমতঃ শিক্ষিত মানুষেরা মান্য চলিত ভাষায় প্রবাদগুলি বলার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষিত মানুষের ধ্বনি ব্যবহারের বিষয়ে রক্ষণশীল। অপরদিকে নিম্নজাতের নিরক্ষর মানুষের মুখের ভাষায় প্রথমত ধ্বনির শেষে 'য' ফলা বা 'অ্যা' ব্যবহার সর্বাধিক।

দ্বিতীয়তঃ নিম্নজাতের নিরক্ষর মানুষের মুখে বাঁকুড়ার নিজস্ব শব্দভাণ্ডারের ব্যবহার বেশি।

তৃতীয়তঃ নিম্নজাতের নিরক্ষর মানুষের মুখে কথার জড়তা, দ্রুতগতি এবং অতিরিক্ত কর্কশতা বেশি।

চতুর্থতঃ নিম্নজাতের নিরক্ষর মানুষের মুখে বাখ্যান বা গালাগাল যুক্ত প্রবাদের সংখ্যা বেশি।

পঞ্চমতঃ নিম্নজাতের নিরক্ষর মানুষেরা সম্মানার্থে 'তুই' বা 'তুমি' দিয়ে কথাবার্তার প্রচলন।কি বইলব তুমাকে / লাজ পাচ্ছে আমাকে।

ষষ্ঠতঃ নিম্নজাতের নিরক্ষর মানুষের মুখে ও>অ, এ>অ্যা ধ্বনির ব্যাপক প্রয়োগ।

সপ্তমতঃ জিহ্বার আড়ষ্ঠতা বা শিক্ষার অভাবে ব্যঞ্জনধ্বনিকে ভেঙ্গে সহজ সরল করার প্রবণতা।

অষ্টমতঃ নাসিক্য ব্যঞ্জন, উষ্মধ্বনি, সমীভবণ, অল্পপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার বেশি।

পরিশেষে বলা যায়,লিঙ্গভেদ, জাতিভেদ, বয়সভেদ, শিক্ষাভেদ থাকলেও যার জন্মভূমি বাঁকুড়া শহরে, সে যতই শিক্ষিত হোক বা উচ্চজাতি হোক বা উচ্চবিত্ত হোক বা উচ্চসংস্কৃতি সম্পন্ন হোক বা সামাজিক মূল্যবোধ থাক না কেন, তার নিজস্ব একটা উচ্চারণ ভঙ্গি বা বাক ভঙ্গি থাকবেই। বাঁকুড়ার এই নিজস্ব ভাষারীতি থেকে সেই মানুষটি স্বতন্ত্র নয়, বাইরের অতিথিদের সাথে মান্যচলিত ভাষায় কথোপকথনের সময় তার মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে আসে বাঁকুড়ার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার বা উচ্চরণের টান। যারা শিক্ষিত মানুষ বা চাকুরিজীবী বা উচ্চজাতি তাদের মুখেও বাঁকুড়ার নিজস্ব ভাষারীতিটি এসে পড়ে।

তথ্যসূত্রঃ

১. রামেশ্বর শ', 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', তৃতীয় সংস্করণ, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, পুস্তক বিপণি, পাতা-৩।

২. উষাপতি বিশ্বাস, 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব', চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৫-২০১৬, ২৯/১ কলেজ রোড, কলকাতা-০৯ পাতা-১৪।

৩. সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩, আনন্দ, কলকাতা-০৯, পাতা-১৫।

৪. অতীন্দ্র মজুমদার, 'ভাষাতত্ত্ব', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭, নয়া প্রকাশ, কলকাতা-১৬, পাতা-৪।

৫. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, নয়া প্রকাশ, কলকাতা-৬, পাতা-১।

৬. পরিমল ভূষণ কর, 'সমাজতত্ত্ব', সপ্তম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা-১৩, পাতা-১৩৯।

৭. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, 'সমাজ দর্শন', সর্বশেষ সংস্করণ ২০১২-২০১৩, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, পাতা-২৮।

৮. অনিরুদ্ধ চৌধুরী, কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু ঘোষ, 'সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ব', পঞ্চম সংস্করণ জুলাই ২০১৫, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, বঙ্কম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, করকাতা-৭৩, পাতা-৪৫।

৯. পবিত্র সরকার, 'ভাষা-দেশ-কাল', প্রথম সংস্করণ, পৌষ, ১৪০৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পাতা-১৫৫।

১০. মৃণাল নাথ, 'ভাষা ও সমাজ', জানুয়ারি, ১৯৯৯, নয়া উদ্যোগ, বিধান সরণী, কলকাতা-০৬, পাতা-১৯৯।

১১. মৃণাল নাথ, 'ভাষা ও সমাজ', জানুয়ারি, ১৯৯৯, নয়া উদ্যোগ, বিধান সরণী, কলকাতা-০৬, পাতা-১৪২।

১২. রামেশ্বর শ','সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', তৃতীয় সংস্করণ, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, পুস্তক বিপণি, পাতা-৬৪৮।